

আল-ফিকহুল আকবর

বিভাগ/অধ্যায়ঃ আল-ফিকহুল আকবর ও ইসলামী আকীদা

রচয়িতা/সঙ্কলকঃ ড. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর (রহ.)

৪. ইলমুল আকীদা বনাম ইলমুল কালাম

আকীদা-শাস্ত্রের আরেকটি প্রসিদ্ধ নাম ‘ইলমুল কালাম’। ইলমুল কালাম বলতে মূলত ধর্মবিশ্বাসের বিষয়ে দর্শন ও যুক্তিবিদ্যা ভিত্তিক আলোচনা বুঝানো হয়। ‘আল-কালাম’ (الكلام) শব্দের অর্থ কথা, বাক্য, বক্তব্য, বিতর্ক (word, speech, conversation, debate) ইত্যাদি। কেউ কেউ মনে করেন যে কালামুল্লাহ বা আল্লাহর কালাম (كلام الله) থেকে ইলমুল কালাম পরিভাষাটির উদ্ভব। কারণ ইলমুল কালামে আল্লাহর কালাম বিষয়ে আলোচনা হয়। তবে জোরালো মত হল, গ্রীক ‘লগস’ (logos) শব্দ থেকে ‘কালাম’ শব্দটি গৃহীত হয়েছে। লগস (logos) শব্দটির অর্থ বাক্য, যুক্তিবৃত্তি, বিচারবুদ্ধি, পরিকল্পনা (word, reason, plan) ইত্যাদি। লগস শব্দ থেকে লজিক (logic) শব্দটির উৎপত্তি, যার অর্থ তর্কশাস্ত্র বা যুক্তিবিদ্যা।

সম্ভবত মূল অর্থের দিকে লক্ষ্য রেখে হিজরী দ্বিতীয় শতকের আরব পন্ডিতগণ ‘লজিক’ শব্দের আরবী প্রতিশব্দ হিসেবে ‘ইলমুল কালাম’ (কথা-শাস্ত্র) পরিভাষা ব্যবহার করেন। পরবর্তীকালে এ অর্থে ‘ইলমুল মানতিক’ শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে, যার আভিধানিক অর্থও ‘কথা-শাস্ত্র’। সর্বাবস্থায় ইলমুল কালাম বলতে দর্শন বা যুক্তিবিদ্যা ভিত্তিক ধর্মতাত্ত্বিক আলোচনা বা গবেষণা (speculative theology, scholastic theology) বুঝানো হয়।

প্রাচীন যুগ থেকে দার্শনিকগণ মানবীয় যুক্তি, বুদ্ধি, জ্ঞান বা দর্শনের মাধ্যমে মানবীয় ইন্দ্রিয়ের অজ্ঞাত বিষয় সমূহ নিয়ে গবেষণা করেছেন। স্রষ্টা, সৃষ্টি, সৃষ্টির প্রকৃতি, স্রষ্টার প্রকৃতি, কর্ম, বিশেষণ ইত্যাদি বিষয়ে যুক্তি তর্ক দিয়ে তাঁরা অনেক কথা বলেছেন। এ সকল বুদ্ধিবৃত্তিক যুক্তিতর্ক মানুষকে অত্যন্ত আকর্ষিত করলেও তা কোনো সত্যে পৌঁছাতে পারে না। কারণ মানুষ যুক্তি বা জ্ঞান দিয়ে স্রষ্টার অস্তিত্ব অনুভব করতে বা নিশ্চিত হতে পারে, কিন্তু স্রষ্টার প্রকৃতি, কর্ম, বিশেষণ, স্রষ্টার সাথে সৃষ্টির সম্পর্ক ইত্যাদি বিষয়ে চূড়ান্ত সত্যে পৌঁছাতে পারে না। এজন্য কখনোই দার্শনিকগণ এ সকল বিষয়ে একমত হতে পারেন নি। তাদের গবেষণা ও বিতর্ক অন্ধের হাতি দেখার মতই হয়েছে।

দ্বিতীয় হিজরী শতক থেকে মুসলিম উম্মাহর মধ্যে গ্রীক, ভারতীয় ও পারসিক দর্শন প্রচার লাভ করে। মূলধারার তাবীয়ীগণ ও তাঁদের অনুসারীগণ বিশ্বাস বা গাইবী বিষয়ে দার্শনিক বিতর্ক কঠিনভাবে অপছন্দ করতেন। কারণ তাঁরা বিশ্বাস করতেন যে, গাইবী বিষয়ে ওহীর উপর নির্ভর করা এবং ওহীর নির্দেশনাকে মেনে নেওয়াই মুমিনের মুক্তির পথ।

ইমাম আবু হানীফা (রাহ) ও তাঁর সহচরগণ ‘ইলমুল কালাম’ শিক্ষা করতে ঘোর আপত্তি করেছেন। ইলমুল কালামের প্রসার ঘটে মূলত দ্বিতীয় হিজরী শতকের প্রথমাংশে, বিশেষত ১৩২ হিজরী (৭৫০ খৃ) সালে আববাসী খিলাফতের প্রতিষ্ঠার পর। ইমাম আবু হানীফা শিক্ষা জীবনে বা তাঁর জীবনের প্রথম ৩০ বৎসরে (৮০-১১০ হি) দর্শনভিত্তিক ইলমুল কালাম সমাজে তেমন পরিচয় লাভ করে নি। তবে দর্শনভিত্তিক বিভ্রান্ত মতবাদগুলো তখন কুফা, বসরা ইত্যাদি এলাকায় প্রচার হতে শুরু করেছে। গ্রীক-পারসিক দর্শন নির্ভর কাদারিয়া, জাবারিয়া, জাহমিয়া

ইত্যাদি মতবাদ দ্বিতীয় হিজরী শতকের শুরু থেকেই জন্ম লাভ করে। এ সকল মতবাদ খন্ডন করতে মূলধারার কোনো কোনো আলিম দর্শন ও যুক্তিবিদ্যা নির্ভর যুক্তি-তর্কের আশ্রয় নিতে থাকেন।

কোনো কোনো জীবনীকার উল্লেখ করেছেন যে, ইমাম আবু হানীফা (রাহ) প্রথম জীবনে এরূপ দর্শন ও যুক্তিবিদ্যা নির্ভর বিতর্ক বা ইলমুল কালামের চর্চা করেন। পরবর্তীতে তিনি তা বর্জন করেন এবং তা বর্জন করতে নির্দেশ প্রদান করেন। ইলমুল কালামের প্রাথমিক অবস্থাতেই তিনি এর ক্ষতি ও ভয়াবহতা অনুধাবন করতে সক্ষম হন। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন:

كنت أعطيت جدلا في الكلام ... فلما مضى مدة عمري تفكرت وقلت السلف كانوا أعلم بالحقائق ولم ينتصبوا مجادلين بل أمسكوا عنه وخاضوا في علم الشرائع ورغبوا فيه وتعلموا وعلموا وتناظروا عليه فتركت الكلام واشتغلت بالفقه ورأيت المشتغلين بالكلام ليس سيماهم سيما الصالحين قاسية قلوبهم غليظة أفئدتهم لا يبالون بمخالفة الكتاب والسنة ولو كان خيرا لاشتغل به السلف الصالحون

“কালাম বা দর্শনভিত্তিক বিতর্কে আমার পারদর্শিতা ছিল ... আমার জীবনের কিছু সময় অতিক্রান্ত হওয়ার পর আমি চিন্তা করলাম যে, পূর্ববর্তীগণ (সাহাবীগণ ও প্রথম যুগের তাবিয়ীগণ) দীন-ঈমানের প্রকৃত সত্য বিষয়ে অধিক অবগত ছিলেন। তাঁরা এ সকল বিষয়ে বিতর্কে লিপ্ত হন নি। বরং ঈমান-আকীদা বিষয়ক বিতর্ক তাঁরা পরিহার করতেন। তাঁরা শরীয়ত বা আহকাম বিষয়ে আলোচনা ও অধ্যয়নে লিপ্ত হতেন, এগুলোতে উৎসাহ দিতেন, শিক্ষা করতেন, শিক্ষা দিতেন এবং এ বিষয়ে বিতর্ক- আলোচনা করতেন। এজন্য আমি কালাম পরিত্যাগ করে ফিকহ চর্চায় মনোনিবেশ করি। আমি দেখলাম যে, কালাম বা দর্শনভিত্তিক আকীদা চর্চায় লিপ্ত মানুষগুলোর প্রকৃতি ও প্রকাশ নেককার মানুষদের মত নয়। তাদের হৃদয়গুলো কঠিন, মন ও প্রকৃতি কর্কশ এবং তারা কুরআন ও সুন্নাহের বিরোধিতা করার বিষয়ে বেপরোয়া। কালাম চর্চা যদি কল্যাণকর হতো তাহলে অবশ্যই পূর্ববর্তীগণ (সাহাবী-তাবিয়ীগণ) এর চর্চা করতেন।”[1]

ইমাম যাহাবী উল্লেখ করেছেন যে, ইমাম আবু হানীফার শিক্ষা জীবনে ‘ইলমুল কালাম’-এর অস্তিত্বই ছিল না।[2] অর্থাৎ এ সময়ে দর্শন ভিত্তিক আকীদা চর্চা কোনো পৃথক ‘ইলম’ বা জ্ঞানে পরিণত হয় নি। কারণ ইমাম আবু হানীফা ১০০ হিজরীর আগেই ফিকহ শিক্ষায় মনোনিবেশ করেন। ইমাম যাহাবী বলেন:

فأفقه أهل الكوفة علي وابن مسعود، وأفقه أصحابهما علقمة، وأفقه أصحابه إبراهيم، وأفقه أصحاب إبراهيم حماد، وأفقه أصحاب حماد أبو حنيفة،

“কুফার সর্বশ্রেষ্ঠ ফকীহ আলী (রা) এবং ইবন মাসউদ (রা)। তাঁদের ছাত্রদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ফকীহ আলকামা। তাঁর ছাত্রদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ফকীহ ইবরাহীম নাখরী (৯৬ হি)। তাঁর ছাত্রদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ফকীহ হাম্মাদ ইবন আবী সুলাইমান (১২০ হি)। তাঁর ছাত্রদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ফকীহ আবু হানীফা।”[3]

উল্লেখ্য যে, ১২০ হিজরীতে ইমাম হাম্মাদের ওফাতের পর ইমাম আবু হানীফা তাঁর স্থলাভিষিক্ত বলে গণ্য হন। এতে প্রমাণ হয় যে, এ সময়ের অনেক পূর্বেই ইমাম আবু হানীফা কুফার অন্যতম শ্রেষ্ঠ ফকীহ বলে গণ্য হয়েছেন।

এতে সুস্পষ্ট যে, ১০০ হিজরীর পূর্ব থেকেই তিনি ফিকহ শিক্ষা ও চর্চায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন। আর ১০০ হিজরীর পূর্বে মুসলিম বিশ্বে দর্শনভিত্তিক আকীদা চর্চা কোনো ‘ইলম’ বা শাস্ত্র হিসেবে প্রকাশ ও প্রসার লাভ করে নি। তাঁর পরিণত বয়সে (১১০-১৫০ হি) সমাজে ইলমুল কালাম চর্চা প্রসার লাভ করে এবং তিনি ইলমুল কালামের চর্চা থেকে তাঁর অনুসারীদেরকে নিষেধ করেন। এ প্রসঙ্গে তাঁর পুত্র হাম্মাদ বলেন:

أخذ أبو حنيفة رضي الله عنه بيدي يوم الجمعة، فأدخلني المسجد، مَرَّ بَقَوْمٍ يَتَنَازَعُونَ فِي الدِّينِ، فَقَالَ: يَا بَنِيَّ! إِذَا مَهَرَ فِي هَذَا الْأَمْرِ، قِيلَ: زَنْدِيقٌ، وَأُخْرِجَ مِنْ حَدِّ الْإِسْلَامِ، فَيَصِيرُ بِحَالٍ لَا يَنْتَفِعُ بِهِ. قَالَ حَمَادُ بْنُ أَبِي حَنِيْفَةَ: وَكُنْتُ مُعْجَبًا بِالْمَنَازَعَةِ، فَتَرَكْتُ الْمَنَازَعَةَ بَعْدَ قَوْلِ الشَّيْخِ

এক শুক্রবারে আবু হানীফা (রাহিমাহুল্লাহ) আমার হাত ধরে মসজিদে প্রবেশ করেন। তিনি দীন (আকীদা) বিষয়ে বিতর্কে (কালাম চর্চায়) লিপ্ত একদল মানুষদের নিকট দিয়ে গমন করেন এবং আমাকে বলেন: বেটা, যে ব্যক্তি এ শাস্ত্রে পারদর্শিতা অর্জন করবে সে যিন্দীক (ধর্মত্যাগী ও ধর্ম অবমাননাকারী) বলে আখ্যায়িত হবে এবং ইসলামের পরিমন্ডল থেকে বহির্ভূত বলে গণ্য হবে। এভাবে সে এমন অবস্থায় পৌঁছাবে যে, তার দ্বারা কোনো কল্যাণ সাধিত হবে না। হাম্মাদ ইবন আবী হানীফা বলেন: আমি এরূপ বিতর্কের বিষয়ে খুবই আগ্রহী ছিলাম। শাইখ (রা)-এর এ কথার পরে আমি এ জাতীয় বিতর্ক পরিত্যাগ করি।”[4]

ইমাম আবু হানীফার ছাত্র নূহ ইবন আবী মরিয়ম বলেন:

قلت لأبي حنيفة رحمه الله ما تقول فيما أحدث الناس من كلام في الأعراض والأجسام فقال مقالات الفلاسفة عليك بالأثر وطريقة السلف وإياك وكل محدثة فإنها بدعة.

“আমি আবু হানীফা রাহিমাহুল্লাহকে বললাম: মানুষেরা ইলমুল কালামে (শ্রষ্টার অস্তিত্ব, অনাদিত্ব ও বিশেষণ প্রমাণে) ‘আরায়’ (অমৌল-পরনির্ভর: nonessential), ‘জিসম’ (দেহ: body) ইত্যাদি বিষয়ক আলোচনা উদ্ভাবন করেছে। এগুলোর বিষয়ে আপনার মত কী? তিনি বলেন: এগুলো দার্শনিকদের কথাবার্তা। তোমার দায়িত্ব হাদীসের উপর নির্ভর করা এবং পূর্ববর্তীদের (সাহাবী-তাবিয়ীদের) তরীকা অনুসরণ করা। সাবধান! সকল নব-উদ্ভাবিত বিষয় বর্জন করবে; কারণ তা বিদআত।”[5]

ইমাম আযমের ছাত্রগণও এভাবে ইলমুল কালাম চর্চা নিষেধ করতে থাকেন। ইমাম আবু ইউসুফ রাহ. (১৮৯ হি) তাঁর ছাত্র ইলমুল কালামের বিশেষজ্ঞ ও মু’তামিলী পণ্ডিত বিশ আল-মারীসী (২১৮ হি)- কে বলেন:

أَلْعِلْمُ بِالْكَلامِ هُوَ الْجَهْلُ وَالْجَهْلُ بِالْكَلامِ هُوَ الْعِلْمُ، وَإِذَا صَارَ الرَّجُلُ رَأْسًا فِي الْكَلامِ قِيلَ: زَنْدِيقٌ.

“কালামের জ্ঞানই হলো প্রকৃত অজ্ঞতা আর কালাম সম্পর্কে অজ্ঞতাই হলো প্রকৃত জ্ঞান। ইলমুল কালামে সুখ্যাতির অর্থ তাকে যীনদীক বা অবিশ্বাসী-ধর্মত্যাগী বলা হবে।”[6]

ইমাম আবু ইউসুফ (রাহ) আরো বলেন:

مَنْ طَلَبَ الْعِلْمَ بِالْكَلَامِ تَزَنَّقَ

“যে ব্যক্তি ইলমু কালাম শিক্ষা করবে সে যিনদীকে পরিণত হবে।”[7]

ইমাম শাফিয়ী রাহ. (২০৪ হি) বলেন,

حُكْمِي فِي أَهْلِ الْكَلَامِ أَنْ يُضْرَبُوا بِالْجَرِيدِ وَالنَّعَالِ وَيُطَافُ بِهِمْ فِي الْعَشَائِرِ وَالْقَبَائِلِ وَيُقَالُ: هَذَا جَزَاءُ مَنْ تَرَكَ الْكِتَابَ وَالسُّنَّةَ وَأَقْبَلَ عَلَى الْكَلَامِ.

“যারা ইলমুল কালাম চর্চা করে তার বিষয়ে আমার বিধান এই যে, তাদেরকে খেজুরের ডাল ও জুতা দিয়ে পেটাতে হবে, এভাবে মহল্লায় মহল্লায় ও কবীলাসমূহের মধ্যে ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়াতে হবে এবং বলতে হবে: যারা কিতাব ও সুন্নাহ ছেড়ে ইলমুল কালামে মনোনিবেশ করে তাদের এ শাস্তি।”[8]

এভাবে প্রসিদ্ধ চার মুজতাহিদ ইমাম এবং দ্বিতীয়-তৃতীয় হিজরী শতকের সকল প্রসিদ্ধ আলিম, ইমাম, ফকীহ ও মুহাদ্দিস অত্যন্ত কঠোর ভাষায় ইলমুল কালামের নিন্দা করেছেন।[9]

পরবর্তী যুগে ইমাম আবু হানীফা ও অন্যান্য ইমামের অনুসারী অনেক আলিম আহলুস সুন্নাহের আকীদা ব্যাখ্যার জন্য ইলমুল কালাম চর্চা করেছেন। বিভ্রান্ত ফিরকাসমূহের বিভ্রান্তির উত্তর প্রদানের প্রয়োজনেই তাঁরা ইলমুল কালামের পরিভাষা ও পদ্ধতি গ্রহণ করেছেন বলে তাঁরা উল্লেখ করেছেন। তবে তাঁরা ইলমুল কালামের দার্শনিক ছায়া থেকে বের হতে পারেন নি। তাদের আলোচনায় সর্বদা কুরআন, হাদীস বা ওহীর বক্তব্যের চেয়ে যুক্তি, তর্ক ও দর্শন প্রাধান্য পেয়েছে।[10]

ইলমুল কালামের বিরুদ্ধে ইমাম আযম ও অন্যান্য ইমামের বক্তব্যকে তাঁরা বিভিন্নভাবে ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। তাঁরা দাবি করেছেন যে, ইমামগণ মূলত ইলমুল কালাম ভিত্তিক মুতায়িলী ও অন্যান্য মতবাদের নিন্দা করেছেন, ইলমুল কালাম ভিত্তিক আকীদা চর্চার নিন্দা তাঁরা করেননি। কিন্তু বাস্তবে আমরা দেখি যে, চার ইমাম ও দ্বিতীয়-তৃতীয় শতকের অন্যান্য ইমাম মূলত ইলমুল কালাম ভিত্তিক আকীদা চর্চার নিন্দা করেছেন। তাঁরা সকলেই আকীদা বিষয় আলোচনা করেছেন এবং অনেকে গ্রন্থ রচনা করেছেন। তবে তাঁরা কুরআন, হাদীস ও সাহাবীগণের বক্তব্যের উপর নির্ভর করে আকীদা ব্যাখ্যা করেছেন। এর বিপরীতে দর্শন ও যুক্তিবিদ্যা নির্ভর আকীদা চর্চা কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন। সঠিক আকীদা প্রমাণের জন্যও দর্শন নির্ভর বিতর্ক তাঁরা নিষেধ করেছেন। কারণ সালফ সালিহীনের আকীদা চর্চা ও ইলমুল কালামের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য ওহী ও আকল-এর অবস্থান।

ইমামগণ বা সালফ সালিহীনের আকীদা চর্চা ওহী নির্ভর, বিশেষত হাদীস ও ‘আসার’ বা সাহাবীগণের বক্তব্য নির্ভর। পক্ষান্তরে ইলমুল কালাম ‘আকল’ অর্থাৎ জ্ঞানেন্দ্রিয়, বোধশক্তি বা বুদ্ধিবৃত্তিক যুক্তি ও দর্শন নির্ভর। ইমামগণের বক্তব্য সর্বদা নিম্নরূপ: তোমার বিশ্বাস এরূপ হতে হবে; কারণ কুরআনে, হাদীসে বা সাহাবীগণের বক্তব্যে এরূপ বলা হয়েছে। পক্ষান্তরে ইলমুল কালামের বক্তব্য নিম্নরূপ: তোমাকে এরূপ বিশ্বাস করতে হবে;

কারণ জ্ঞান, বিবেক ও যুক্তি এটিই প্রমাণ করে। আমরা ওহী ও আকলের অবস্থান সম্পর্কে ইমামগণের মত আকীদার উৎস বিষয়ক অনুচ্ছেদে বিস্তারিত আলোচনা করব ইনশা আল্লাহ। এখানে সংক্ষেপে নিম্নের বিষয়গুলো লক্ষণীয়:

(ক) আমরা দেখেছি যে, ইমাম আবু হানীফার ছাত্র নূহ ইবন আবী মরিয়ম যখন তাকে ইলমুল কালামের আরায (অমৌল), জিসম (দেহ) ইত্যাদি সম্পর্কে প্রশ্ন করেন তখন তিনি বলেন: “এগুলো দার্শনিকদের কথাবার্তা। তোমার দায়িত্ব হাদীসের উপর নির্ভর করা এবং পূর্ববর্তীদের (সাহাবী-তাবিয়ীদের) তরীকা অনুসরণ করা। সাবধান! সকল নব-উদ্ভাবিত বিষয় বর্জন করবে; কারণ তা বিদআত।”

ইলমুল কালাম চর্চা করতে গেলে এ সকল পরিভাষার উপর নির্ভর করা ছাড়া কোনো উপাই নেই। মহান আল্লাহর অস্তিত্ব, একত্ব, বিশেষণ ইত্যাদি প্রমাণের জন্য আরায, জিসম, জাওহার ইত্যাদি পরিভাষাগুলোই কালামবিদগণের একমাত্র ভিত্তি। এ থেকে আমরা নিশ্চিত হই যে, ইমামগণ মূলত সাহাবী তাবিয়ীদের পদ্ধতিতে ওহী-নির্ভর আকীদা চর্চায় উৎসাহ দিয়েছেন এবং দার্শনিকদের পরিভাষা এবং দার্শনিক যুক্তিতর্ক নির্ভর ইলমুল কালাম ভিত্তিক আকীদা চর্চা নিষেধ করেছেন।

(খ) ইমামগণ ফিকহ ও কালাম উভয় ক্ষেত্রেই কুরআন, হাদীস ও আসার বা সাহাবী-তাবিয়ীগণের বক্তব্যের উপর সমানভাবে নির্ভর করেছেন। ফিকহের ন্যায় আকীদার ক্ষেত্রেও তাঁরা ‘খাবারুল ওয়াহিদ’ বা একক বর্ণনার সহীহ হাদীসগুলোর উপর নির্ভর করেছেন। আর এজন্যই ইমাম আযম আকীদাকেও ‘ফিকহ’ বলেছেন এবং আল-ফিকহুল আকবার বা আল-ফিকহু ফিদ্বীন বলে আখ্যায়িত করেছেন। পক্ষান্তরে কালামবিদগণ ফিকহ ও আকীদার মধ্যে পার্থক্য করেছেন। তারা দাবি করেছেন যে, ফিকহ বা কর্মের ক্ষেত্রে হাদীস, খাবারুল ওয়াহিদ বা সাহাবী-তাবিয়ীগণের বক্তব্যের উপর নির্ভর করা যায়, কিন্তু বিশ্বাস বা আকীদার ক্ষেত্রে আকলের বিরুদ্ধে কারো বক্তব্য গ্রহণ করা যায় না বা কারো ‘তাকলীদ’ করা যায় না।

(গ) ইমামগণের দৃষ্টিতে ওহী বা কুরআন-হাদীসের বক্তব্য মানুষকে সত্যের নির্দেশনা প্রদানের জন্য। শিক্ষিত-অশিক্ষিত, সাধারণ-অসাধারণ সকল মানুষ যেন বিশ্বাস ও কর্মের ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতা-বহির্ভূত ও ইন্দ্রিয়-বহির্ভূত বিষয়গুলোতে সহজ দিক নির্দেশনা লাভ ও সত্য অনুসরণ করতে পারে সেজন্যই মহান আল্লাহ নবী-রাসূলগণের মাধ্যমে ওহী ও কিতাব প্রদান করেন। এজন্য দীন ও শরীয়তে বা বিশ্বাস ও কর্মে সকল ক্ষেত্রে ওহীর বক্তব্যকে সর্বদা সরল ও প্রকাশ্য অর্থে গ্রহণ করতে হবে এবং এর রূপকার্থ ও দূরবর্তী ব্যাখ্যা বর্জন করতে হবে। ওহীকে রূপকার্থে ব্যবহার করা বা ওহীর দূরবর্তী ব্যাখ্যা করার অর্থ ওহীকে অকার্যকর করা। এজন্য তাঁরা যেভাবে সালাত, সিয়াম, যাকাত, হজ্জ ইত্যাদি কর্ম বিষয়ক নির্দেশনার রূপক অর্থ গ্রহণ ও ব্যাখ্যা কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন, তেমনি মহান আল্লাহর বিশেষণ, আখিরাত, কিয়ামতের আলামত, কবর, হাশর ও অন্যান্য বিশ্বাসীয় বিষয়েও ওহীর বক্তব্যের রূপক অর্থ গ্রহণ ও ব্যাখ্যা কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন। এর বিপরীতে ইলমুল কালামের দৃষ্টিতে ওহীর নির্দেশনা অস্পষ্ট ও এতে রূপকের সম্ভাবনা ব্যাপক। এজন্য বিশ্বাসের বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে আকলের উপর নির্ভর করতে হবে। ওহীর কোনো বক্তব্য আকলের ব্যতিক্রম হলে তা রূপক অর্থে ব্যাখ্যা করতে হবে।

(ঘ) ইমামগণের দৃষ্টিতে বিশ্বাস ও কর্মে সকল ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ও তাঁর সাহাবীগণই পূর্ণতম আদর্শ। তাঁদের মত হওয়া বা হুবহু তাঁদের অনুসরণ করাই মুমিনের লক্ষ্য। অন্যান্য বিষয়ের ন্যায় আকীদা চর্চায়ও উদ্দেশ্য আকীদা বিষয়ে সুন্নাহের প্রতিষ্ঠা ও পুনরুজ্জীবন। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ও সাহাবীগণের আকীদার সাথে মুমিনের আকীদার হুবহু

মিল প্রতিষ্ঠাই এখানে উদ্দেশ্য। পক্ষান্তরে ইলমুল কালামের উদ্দেশ্য আকল, বুদ্ধি ও বিবেক খাটিয়ে বিশ্বাস বিষয়ক সত্যে উপনীত হওয়া। কুরআন, সুন্নাহ বা সাহাবীগণের সাথে মিল ও অমিল এখানে গৌণ। মিল হলে ভাল কথা, নইলে কোনোরূপ ব্যাখ্যা করলেই হলো।

(ঙ) ইমামগণের আকীদা চর্চার ক্ষেত্রে মতভেদের সুযোগ খুবই সীমিত। কারণ সকলেই ওহীর উপর নির্ভর করেছেন এবং ওহীর ব্যাখ্যা বর্জন করেছেন। আর ওহীর মধ্যে ভিন্নতার অবকাশ খুবই কম। পক্ষান্তরে ইলমুল কালাম চর্চায় সকলেই জ্ঞান, যুক্তি ও বুদ্ধি-বিবেকের উপর নির্ভর করেছেন এবং ওহীকে নিজ নিজ বুদ্ধি-বিবেক অনুসারে ব্যাখ্যা করেছেন। জ্ঞানবুদ্ধি ও যুক্তির কোনো নির্ধারিত মানদণ্ড নেই। কেউ দেবতার জন্য নরবলিকেও আকল-নির্দেশিত বা জ্ঞান ও যুক্তিসঙ্গত বলে প্রমাণের চেষ্টা করছেন। আবার কেউ জীবন ধারণের জন্য মাংস ভক্ষণকে অযৌক্তিক বা বিবেক বিরুদ্ধ বলে দাবি করছেন। এজন্য কালাম ভিত্তিক আকীদা চর্চায় মতভেদ খুবই বেশি।

ফুটনোট

- [1] কুরাশী, তাবাকাতুল হানাফিয়াহ, পৃষ্ঠা, ৪৬৮।
- [2] যাহাবী, সিয়রু আ'লামিন নুবালা ৬/৩৯৮।
- [3] যাহাবী, সিয়রু আ'লামিন নুবালা, খন্ড ৫, পৃষ্ঠা ২৩১-২৩৬।
- [4] সাঈদ নাইসাপুরী হানাফী, আল-ইতিকাদ, পৃষ্ঠা ১৭৭।
- [5] হারাবী, আব্দুল্লাহ ইবন মুহাম্মাদ আনসারী, যাম্মুল কালাম ওয়া আহলিহী ৫/২০৬-২০৭।
- [6] ইবন আবিল ইয়্য, শারহুল আকীদাহ আত-তাহাবিয়াহ, পৃ. ৭৫
- [7] ইবন আবিল ইয়্য, শারহুল আকীদাহ আত-তাহাবিয়াহ, পৃ. ৭৫
- [8] ইবন আবিল ইয়্য, শারহুল আকীদাহ আত-তাহাবিয়াহ, পৃ. ৭৫
- [9] গাযালী, ইহইয়াউ উলুমিদ্দীন ১/৩৩, ৫২-৫৩; ইবন আবিল ইয়্য, শারহুল আকীদাহ আত-তাহাবিয়াহ, পৃ. ৭২-৭৭, ২০৪-২১০।
- [10] গাযালী, ইহইয়াউ উলুমিদ্দীন ১/৩৩, ৫২-৫৩; ইবন আবিল ইয়্য, শারহুল আকীদাহ আত-তাহাবিয়াহ, পৃ. ৭২-৭৭, ২০৪-২১০।

Source — <https://www.hadithbd.com/books/link/?id=7081>

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন